ভূমিকা

তুর্কী শাসনে বিপর্যস্ত অসহায় বাঙালী জীবনে যে বিশেষ ভক্তিবাদকে আশ্রয় করে অস্তিত্ব রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছিল তারই এক সাহিত্যিক প্রকাশ 'মঙ্গলকাব্য'। এই ভক্তিবাদের মূল কথাছিল আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস এবং দেবানুগ্রহে পরম নির্ভরশীলতা। অনার্য অলৌকিক উপাদানের উপর আর্য ঐতিহ্যের প্রলেপ সঞ্চারে এই ভক্তিবাদের ভিত্তি রচিত হয়েছিল। একাধানে ক্রোধ পরায়ণা দেবদেবীদের কেন্দ্র করে মনসামঙ্গল, চণ্ডী মঙ্গল, ধর্মমঙ্গল এবং অন্নদা মঙ্গল কাব্য। আর মধ্যযুগের এই মঙ্গলকাব্য ধারা পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবাহিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতককে বলা হয়। মন্বন্তরের কাল। মুঘল সম্রাজ্যের অবসান; পলাশির প্রান্তারে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা; অত্যাচার, অনাচার, মানুষের মৃত্যুর মিছিল, রোগ সজ্জায় সমগ্র বাঙালী জাতি। তারই প্রভাব থেকে মানব জাতি মুক্তির নিশানায় 'কালিকামঙ্গল' 'শীতলামঙ্গল' 'ষষ্ঠীমঙ্গল' 'রায়মঙ্গল' 'গঙ্গামঙ্গল' 'অনাদিমঙ্গল' ইত্যাদি মঙ্গল কাব্যগুলি মানব মুক্তির সান্ত্বনা স্বরূপ।

আপন পূজা প্রচারের জন্য দেবলোক থেকে অভিশাপগ্রস্থ স্বর্গভ্রষ্ট দেবদেবীরা মর্ত্যলোকে পূজা প্রচারে মঙ্গলকাব্যগুলির অনিবার্যতা লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে মনসা মঙ্গল কাহিনী ধারা প্রবাহিত। মনসা নিজ পূজা প্রচারের জন্য চন্দ্রধন বণিকের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে। শিবের একান্তভক্ত চাঁদের কাছে মনসা পূজা যাচাঞা করে, একদিকে মনসা আর এক দিকে চাঁদ ও তার বনিক পরিবারের নির্মম দশা সব মিলিয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘটনা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মর্ত্য মানবের চরিত্র অঙ্কনে, ঘটনার ঘনঘটায় মনসা মঙ্গলের কবিরা-নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত, কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ প্রমুখ কবির সিদ্ধহস্তে মনসা মঙ্গলকাব্য ঔজ্জ্বলতা পেয়েছে। শব্দচয়ন, ছন্দ, আলংকরিক সৌন্দর্য, অপরদিকে চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠায় এই কাব্যের কবিরা পারদর্শিকতা দেখিয়েছেন।

মঙ্গলকাব্যের এই ধারা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও লক্ষ্য করা যায়। দেবী চণ্ডী নিজ পূজা প্রচারের জন্য মর্ত্য মানবের কাছে উপনিত হয়েছে বিভিন্ন কৌশল পদ্ধতির মাধ্যমে। ষোড়শ শতাব্দীর চণ্ডী মঙ্গল কাব্য মূলত দুটি ধারা- (ক) কালকেতু ও ফুল্লরা কাহিনী (খ) ধনপতি ও শ্রীপতি কাহিনী। এই কাব্যে বিষয়বস্তুকে কেন্দ্রকরে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কাহিনীর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘটনা চরিত্রের অলিন্দে প্রবেশ করে একাব্যকে ঔপানাসিক দৃষ্টি ভঙ্গির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। সমগ্র মঙ্গল ক্যাব্যের ইতিহাসে মুকুন্দরাম সবচেয়ে শক্তিশালী কবি। কালকেতু ফুল্লারা কাহিনী কিম্বা ধনপতি শ্রীপতি কাহিনীর মধ্যে যেমন শব্দচয়ন, আলঙ্করিক সৌন্দর্য প্রবাদ প্রবচনের অসাধারণ প্রয়োগ সমগ্র বাংলা সাহিত্যের এই অভিনব প্রয়াস কবি কঙ্কনের চণ্ডী মঙ্গল কাব্যের বিষয় বৈচিত্রকে প্রধান মঙ্গল কাব্যের আঙিনায় সর্বোচ্চ শিখরে স্থান করেনিতে অসুবিধে হয় না।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অনার্য প্রভাবে ধর্মমঙ্গলকাব্যে পূজার্চনা সমগ্র হিন্দু সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। রূপরাম চক্রবর্তী এবং ঘনরাম চক্রবর্তী এদের রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্য উচ্চ মার্গের কাব্য হিসাবে পরিগণিত। ডঃ সুকুমার সেন ধর্মমঙ্গল কাব্যকে 'রাঢ়ের মহাকাব্য' বলে চিহ্নিত করেছেন। একাব্যে দেবতা প্রস্তর খন্ডে, পাদুকা চিহ্নে, কুর্মাকৃতি কখন বা ডিম্বাকৃতি ইত্যাদি কে ধর্ম ঠাকুর হিসাবে মানুষ পূজার্চনা করত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধর্ম ঠাকুরকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা বলেছেন। একাব্যের দুটি কাহিনী-(ক) রাজা হরিশচন্দ্র ও শৈব্যা (খ) লাউসেন ও রঞ্জাবতী পালা দুটি পালাতেই ঘটনা, চরিত্র সৃষ্টি এবং উচ্চ মধ্য নিম্নবৃত্ত বিভিন্ন পেশার জীবন জীবিকা কবিত্বের ভাষায় অসাধারণ সৃষ্টি হিসাবে পরিগণিত। কাহিনী গ্রন্থন, চরিত্র সৃষ্টি, নির্মাণ কৌশল, শব্দচয়ন এবং আলংকরিক সৌন্দর্যে প্রধান মঙ্গলকাব্যের উল্লেখ যোগ্য সৃষ্টি সম্পদ।

যুগসন্ধির সময় বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত শক্তিমান কবি রায়গুনাকর ভারতচন্দ্র তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'অন্নদামঙ্গলকাব্য'। এ কাব্যের তিনটি খন্ড- ক) অন্নদামঙ্গল খ) অন্নপূর্ণা মঙ্গল বা মানসিংহ গ) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর। তিনটি খন্ডেই ঘটনা, চরিত্র সৃষ্টি, কাহিনীর ঐতিহাসিকতা, পৌরাণিকতা এবং বাস্তব সামাজিক প্রেক্ষাপট কবির কবিত্বের স্পর্শে এ কাব্য রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'রাজকণ্ঠের মণিমালা' স্বরূপ। কবির শব্দচয়ন, কাহিনী গ্রন্থন, ছন্দ, অলংকার এবং প্রবাদ

প্রবচন প্রয়োগের সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর গণ্ডি অতিক্রম করে এ কাব্য মানব জাতির অনাদিকালের সম্পদে পরিণত হয়েছে।

বাংলার প্রধান মঙ্গলকাব্যের গণ্ডি অতিক্রম করে অষ্টাদশ শতাব্দীর কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল,অনাদিমঙ্গল ইত্যাদি মঙ্গলকাব্য গুলি কেন অপ্রধান- এই কৌতুহল আমাকে অপ্রধান মঙ্গলকাব্য চর্চায় নিবিষ্ট করেছে। বলা বাহুল্য একুশ শতকেও এই অপ্রধান মঙ্গ ল কাব্যগুলির দেবদেবীরা বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবাংলার প্রত্যন্তর অঞ্চলের হিন্দু -মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ অকুণ্ঠ চিত্তে তাদের বিনম্র শ্রদ্ধা এবং পূজার্চনা আজও চলেছে। প্রাসঙ্গি কভাবে বলা যায় বরং প্রধান মঙ্গলকাব্যে অনেক দেবতা ব্রাত্য বললে অত্যুক্তি হয়না। সে কারণেই অপ্রধান মঙ্গলকাব্য হিসাবে আমি-কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, এই মঙ্গলকাব্যগুলিকে আমার গবেষণার বিষয় হিসাবে গ্রহন করেছি।

অষ্টাদশ শতাব্দির কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর -কাব্যে ভারতচন্দ্র, গোবিন্দ দাস, শ্রী মধুসূদন, কবীন্দ্র, ক্ষেমানন্দ, বলরাম চক্রবর্তী এবং রামপ্রসাদ প্রমূখ কবিরা এ বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। বেশিরভাগ কবির পুঁথি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য আমি কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তীর কালিকামঙ্গ ল পুঁথিটির বিষয় বৈচিত্র, স্বকীয়তা, স্থান, সমসাময়িকতা এবং গ্রন্থটির প্রাচীনতা লক্ষ্য করা যায়। কবি বলরাম কে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবি বলিয়া অনেক সমালোচক মনে করেন। আবার অনেকেই বলেন তিনি প্রাণরাম প্রমুখ কবির পরবর্তী। কাব্যপাঠে তার ভাষা, ঘটনাক্রম, শব্দচয়ন, চরিত্র সৃষ্টি গুপ্ত প্রণয় এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এসবই গবেষণায় সাপেক্ষ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শীতলামঙ্গ কাব্য মূলত দ্বিজনিত্যানন্দ, কৃষ্ণ দাস, কবিবল্লভ, প্রমুখ কবিরা এ কাব্য রচনা করেছেন। এঁদের অনেকেরই পুঁথি দুষ্প্রাপ্য। দ্বিজনিত্যানন্দ বিরচিত শীতলামঙ্গল এর কাহিনির

চারটি পালা- (ক) গোকুল পালা (খ) বিরাট পালা (গ) চন্দ্র কেতুর পালা (ঘ) রঘুনাথ দত্তের পালা-একাব্য পর্যায় ক্রমিক ভাবে সুগ্রথিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অস্থিরতা জঙ্গমতা মানব জীবনে বিভিন্ন রোগব্যাধি-বসন্ত,কলেরা প্রভৃতি হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শীতলার কাছে আত্মসর্মপন করে তৎকালীন সাধারণ মানুষ। কবি নিত্যানন্দ এ কাব্য রচনায় কতখানি

বিষয় বৈচিত্র সক্রিয়তা দেখাতে পেরেছেন তার কাব্যে অনুধাবন করে বোঝা যায়। একুশ শতকে আজও এ কাব্য অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত পূজার্চনা ও পাঠ হয়ে থাকে।

রায়মঙ্গল কাব্য বাংলা মঙ্গলকাব্যের এক অভিনম সৃষ্টি। যেখানে প্রাগার্য সমাজের ব্যাঘ্রপূজা হত, এমনকি মহেঞ্জোদারো আবিস্কার সেখানে শিবের বস্ত্র ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত। রায়মঙ্গলের কাব্যে দক্ষিণ রায়ের পুজো এবং মাহাত্ম্যকীর্তন অবলম্বন করে কৃষ্ণ দাস এবং পরবর্তীকালে এই একই ঘটনা অবলম্বন করে মোহাম্মদ খাতের সাহেব প্রণীত 'বোন বিবী জহুরা নামা' গ্রন্থটি রচনা করেন। বর্তমানে রায়মঙ্গল কাব্যে ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায় এর পুজো বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে নদী মাতৃক বাদাবন অঞ্চলে প্রায় সারা বছরই পুজার্চনা হয়। এবং এই পুজো আদায়ে দক্ষিণ রায়ের যে অলৌকিক মহিমা আছে তা কাব্যের সমস্ত চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়। নিম্নবিও সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা তাদের বাধ্য করেছে দক্ষিণরায় এবং কালুরায়ের পুজো করতে। সে কারণে এই অপ্রধান কাব্যের গুরত্ব একুশ শতকে প্রাসঙ্গিক হলেও কেনতা অপ্রধান তা গবেশণার বিষয় হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ।